

কল্পলোকের সীমানা পেরিয়ে : এভু ডেভু

বন্যা আহমেদ

প্রায় এক দশক হতে চললো, কিন্তু মনে হয় যেন এই তো সেদিনের ঘটনা! বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রাপ্তে দাঁড়িয়ে আমরা প্রথমবারের মত জানতে যাচ্ছি আমাদের নিজেদের শরীরের একান্ত গভীরে কোষগুলোর মধ্যে জিন বা বংশগতি-এককের সংখ্যা কত! বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ এরিক ফ্রম বোধ হয় ঠিকই বলেছিলেন, মানুষই একমাত্র প্রাণী যার কাছে নিজের অস্তিত্বটাই যেন একটা বড় সমস্যা এবং সে নিরস্তর তার উত্তরও খুঁজে চলেছে।

এত বুদ্ধিমান প্রাণী আমরা, এত জটিল মিস্টিকের গড়ন, আমাদের মধ্যে যে রকম বুদ্ধিমত্তার ছড়াচাঢ়ি, আর কোন প্রাণীতেই বা তা দেখা যায়? আমরা মানুষ - কি না করতে পারি! এই প্রথিবীর বুকে আমাদের মত অতুলনীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর জিনের সাথে আর কেন প্রাণীর জিনের তুলনা হয় নাকি? এত জটিল একটা প্রাণীর বিকাশ তো আর যা তা কথা নয়। বিবর্তনের ধারায় জীব যত জটিল থেকে জটিলতর আকৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হবে তার জিনের সংখ্যা ও তো ততই বেশি হতে থাকবে! একটা সামান্য গোল কৃমির (*norhabditis elegans*) যদি ১৯,৫০০ জিন থাকে, সামান্য ছুট ফ্লাইয়ের আছে ১৩,৭০০, আর ঐ ধেড়ে ইঁদুরের জিনের সংখ্যা যদি ৩০,০০০ হয় তাহলে আমাদের তো তার চেয়ে বহুগুণ বেশি জিন থাকতেই পারে। আমাদের দেহে প্রায় এক লাখের মত প্রোটিন তৈরি হয়, প্রতিটি প্রোটিন তৈরির পিছনে যদি একটা করেও জিন থাকে তাহলেই তো কেন্দ্রাফতে,

আমাদের ক্রমোজমে জিনের সংখ্যা চোখ বন্ধ করেই এক লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা।

আসল কাজটা ১৯৯০ সালে শুরু হলেও সেই আশির দশকের প্রথম থেকেই মানুষের জিনোম সংশ্লিষ্ট নিয়ে হৈচৈ শোনা যাচ্ছিল। বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্লনা-কল্পনারও যেন শেষ নেই, এমনকি বাজি ধরাধরিও চলছিল। প্রাথমিক অনুকল্প অনুযায়ী সবাই তো মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, মানুষের জিনোমে কম করে হলেও এক লাখ বিশ হাজারের মত জিন থাকতে হবে। এর চেয়ে কম জিন দিয়ে তো মানব শরীরের জটিল অঙ্গ প্রত্যসের গঠনই সম্ভব হওয়ার কথা নয়, সেখানে জটিল মিস্টিক বা স্নায়বিক কাজকর্মগুলো তো বহুদুরের কথা। শুধু প্রাচীন ধর্মবেত্তা আর চিনাবিদেরাই যে মানুষকে আর সব প্রাণী থেকে আলাদা করে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃষ্টি’র বেদীতে বসিয়েছিলেন তাই তো নয়, এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে আমরাই বা কম কি? মানুষের মত এত ‘উন্নত’ প্রাণীর জিনের সংখ্যা তো লাখ ছাড়িয়ে যেতেই হবে! পার্থক্য শুধু এই যে, প্রাচীনকালে ওনারা বিশ্বাসের রঙিন ফানুসের ওপর ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন আর আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রাপ্তে এসে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েও একই ধারার ভুলগুলো করে বসি। হাজার হাজার বছরের লালন করা ঔদ্ধত্য (নাকি অজ্ঞানতা) বলে না কথা, ধোপার পাটায় ধূয়ে মুছে সাফ হতেও তো সময় লাগারই কথা।

সে যাই হোক, ২০০০ সালে জিনোম প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা ‘ডি এন এ’র নিউক্লিওটাইডের সংশ্লিষ্টণের কাজ প্রায় গুটিয়ে আনতে শুরু করেন। বহুদিনের সাধনার ফসল-বের হল মানুষের জিনোম সংশ্লিষ্টণের প্রথম খসড়া রিপোর্ট। সামনে এক পরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বিজ্ঞানীদের জন্য! এক ধরনের হতাশা মেশানো বিস্ময় নিয়ে জানতে পারলাম যে আমাদের এবং ইঁদুরের জিনের সংখ্যা প্রায় সমান। ৩০-৩৫ হাজারের বেশি প্রোটিন তৈরির জিন নেই মানুষের কোষে! তখন থেকে পরবর্তী কয়েক বছরে বহুবারই এই সংখ্যাটা ঘষামাজা করতে হয়েছে - নাহ উপরে দিকে নয়, ক্রমশঃ নিচের দিকেই নেমে গেছে এই সংখ্যাটা। ১৩ বছরের গবেষণার পর ২০০৩ সালে যখন চূড়ান্ত রিপোর্ট বের হল তখন ইতোমধ্যেই সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ২০-২৫ হাজারে, ২০ হাজারের কাছাকাছি। তার মানে কি আমাদের জিনের সংখ্যা ওই সামান্য মূরগীর সমান কিংবা ইঁদুর বা ভূট্টার চেয়েও কম? তাই বা সম্ভব কীভাবে?

শুধু জিনোম প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরাই যে এ ধরনের বিস্ময়কর ফলাফল পাচ্ছিলেন তা তো নয়, অনুজীববিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন গবেষণাও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। যেমন ধরুন, মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর জিনোম ৯৮-৯৯ ভাগই মিলে যায় -এ থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত এক প্রশ্নের উত্তর পেলেও, সেটা থেকে যে আরেক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে তার উত্তর তো আর দেওয়া যাচ্ছিল না খুব সহজে। বুঝালাম, এতে করে প্রমাণ হয় যে, শিম্পাঞ্জীরা আমাদের

সবচেয়ে কাছের আতীয়, তাদের আর আমাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ না হয় একই ছিল! কিন্তু, জিনের সবকিছুই যদি এতই এক হবে তাহলে শিম্পাঞ্জীর সাথে মানুষের এতটা পার্থক্য এল কোথা থেকে? মাত্র এক থেকে দেড় ভাগ পার্থক্য কি করে গঠনে আকারে বৃদ্ধিমত্তায় এতটা ভিন্নতার কারণ হতে পারে? কিংবা, ধরন, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি তৈরি হতে যদি এত কাঢ়িকাড়ি নতুন জিনের প্রয়োজন হয় তাহলে তা-ই বা তৈরি হচ্ছিল কোথা থেকে? এই কোটি কোটি নতুন প্রজাতির বিবর্তনের পিছনে তাহলে কত নতুন জিনের দরকার হয়েছিল? একেক জীব কেন দেখতে একেক রকম, আকারে এবং গঠনে এত প্রভেদ এল কোথা থেকে? আবার ধরন, নিষিক্ত ডিম্বাগু বা একটা মাত্র কোষ থেকে শুরু হয় আমাদের জীবনের আগামীর দূর্যোগ। তারপর কয়েক দিন, সপ্তাহ বা মাসের ব্যবধানে কি করে অযুত-লক্ষ-কোটি কোষের সমন্বয়ে জটিল সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানব শিশুর উৎপন্নি ঘটে সেখান থেকে? ভূগ্রের এই বিকাশের সাথে প্রাণের বিবর্তনের সম্পর্কটাই বা কী?

ডারউইন এবং টি এইচ হাক্সলী কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বিবর্তনের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই ভূগতত্ত্বের মাঝেই, এর মধ্যেই পাওয়া সম্ভব এই প্রশংগলোর উত্তর। বিভিন্ন লেখায় এবং পুস্তকে সে কথা উল্লেখও করেছেন তাঁরা। কিন্তু কীভাবে একটা নিষিক্ত ডিম্বাগু থেকে এত জটিল সব প্রাণীর উত্তর হয় সেটা বোঝার জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে অগ্রসরতা প্রয়োজন তা তখনকার জীববিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না। তার ফলে ভূগতত্ত্ব জীববিজ্ঞানীদের কাছে অন্দকার কুর্যারি (Black box) হয়েই ছিল গত প্রায় দেড়শ বছর।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা হাবুড়ুর খাচিলেন ডারউইনের দেওয়া বিবর্তন তত্ত্বের সাথে নবাবিস্তৃত বশ্বগতিবিদ্যার সমন্বয় করতে। তখনো জিনের অবিক্ষেপ না হওয়ায় ডারউইন জীববিজ্ঞান অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় এবং ভিন্নতা (Variation) আসলেই কীভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি তিনি।

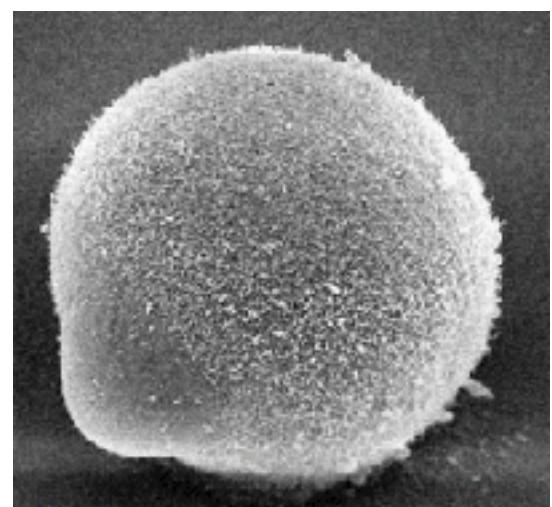
এ পর্যায়ে মেডেলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান যখন পুনরাবিক্রিত হয় ১৯০৫ সালে, তখন তা থেকে ভিন্নতার (Variation) ব্যাখ্যা দেওয়া গেলেও গোল বাঁধলো আরেক জায়গায়। পরিবর্তন এবং ভিন্নতা যদি এত ক্ষুদ্র জিনের স্তরেই ঘটে থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এত বৃহত্তর ক্ষেলে প্রাণের বিবর্তন এবং প্রজাতির উত্তর ঘটে কীভাবে। একেক বিজ্ঞানী বিবর্তনকে একেক দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, ফসিলেবিদেরা বিস্তৃত ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিধিতে প্রজাতির বিবর্তনে মেতে রইলেন, সিস্টেমেটিস্টরা বিভিন্ন প্রজাতির প্রকৃতি এবং প্রজাতি তৈরির প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করলেন, আবার ওদিকে জেনেটিস্টরা কাজ শুরু করলেন প্রজাতির ভিতরে ভিন্নতা এবং জিনের প্রভাব নিয়ে। তারপর চালিশের দশকে এসে এদের সমন্বয় ঘটলো মর্ডান সিস্টেমস বা আধুনিক সংশ্লেষণের মাধ্যমে। দু'টো প্রধান

ধারণার সমন্বয় ঘটে এসময়ঃ

১. প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় ছেট ছেট জেনেটিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্ত্যতার উৎপন্নি ঘটে তাকে খুব সহজেই ধীর প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকা বিবর্তনতত্ত্বের মাধ্যমে ব্যব্যস্থা করা সম্ভব, এবং

২. দীর্ঘ সময়ের বিস্তৃতিতে ঘটা এই একই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি বা এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে বেশ বড় ক্ষেত্রের বিবর্তনও ঘটে থাকে। গত শতাব্দীর বাকি সময় ধরে এই আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্বই জৈববিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে [১]।

এখন দ্রুত অগ্রগামিতার বোতামটা টিপে প্রায় ৫-৬ দশক সামনে চলে এসে এখনকার অবস্থান থেকে যদি আধুনিক সংশ্লেষণকে বিচার করতে চাই, তাহলে বলতেই হয় যে, সেই সময়ে এটাই সবচেয়ে ‘আধুনিক’ তত্ত্ব হলেও আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এর সীমাবদ্ধতাটা আসলে চোখে পড়ার মতই। আমরা এ তত্ত্ব থেকে জানতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিবর্তন ঘটেছে, আকারে গঠনে বদলে যাচ্ছে প্রাণী, উৎপন্নি ঘটেছে নতুন নতুন প্রজাতির। কিন্তু আকারে, গঠনে এই পরিবর্তন ঘটছে কীভাবে? নিষিক্ত ডিম্বাগুর একটি কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবে পরিণত হতে যে আকার বা গঠনগুলোর বিকাশ ঘটে তার উৎপন্নিই বা ঘটছে কীভাবে? ভূগতস্থায়, কোন জিন বা জিনগুচ্ছের সক্রিয় পরিচালনায় ঘটে চলেছে অত্যাশার্য এই বিকাশের নাটক? অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়া ‘কী ঘটছে’ তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও ‘কীভাবে ঘটছে’ তা কিন্তু রহস্যের বেড়াজালেই আটকে ছিল এতদিন।



চিত্র ১: সব জীবই একটি মাত্র কোষ থেকে শুরু করে তাদের জীবনের বিকাশ ঘটায়। এখানে ইঁদুরের নিষিক্ত ডিম্বাগুর বিকাশ দেখানো হয়েছে।

নাহ, এই অজানা প্রশ়ঙ্গলো আর অজানা নেই জীববিজ্ঞানীদের কাছে। অন্ধকার কুঠুরীর রংধন্দারগুলো একটা একটা করে খুলতে শুরু করেছে। গত দুই-তিনি দশকে স্থিতত্ত্ববাদী এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তাদের সাথে তর্কাতর্কিতে আমরা টেরই পাইন যে নিরবে কি এক বিশাল বিশ্বের ঘটে গেছে জীববিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলোতে। সত্যি কথা বলতে কি জীববিজ্ঞানের মেন এক শুণগত উল্ল্লফন ঘটে গেছে এরই মধ্যে। বিবর্তন ‘ঠিক কি বেঠিক’ সে তাত্ত্বিক স্তর পার হয়ে আমরা যে প্রায়োগিক বিবর্তনীয় বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি তা বুঝতেও পারিনি বিবর্তন-বিরোধীদের সাথে অন্তহীন তর্ক-বিতর্কের ডামাডোলে। কিন্তু সন্তরের দশকের শেষ থেকেই আগবিক জীববিজ্ঞান এবং জেনেটিক্সের বিভিন্ন শাখায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে অভাবনীয় উন্নতি ঘটতে শুরু করে। তার সাথে যুক্ত হয় কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ, আর এখান থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত যে কোন জীবকে তার জেনেটিক স্তরে বিস্তারিতভাবে দেখতে এবং গবেষণা করতে শুরু করেন।

বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণাগারে যে পরীক্ষা নিরীক্ষাসমূহ চালিয়ে যাচ্ছেন তা শুধু কল্পবিজ্ঞানের সীমানার চার দেওয়ালে বন্দী ছিল এতদিন। কার্টুনের সেই মিউট্যান্ট নিনজা টারটেলের মত এখন মিউট্যান্ট ফলের মাছি তৈরি হচ্ছে গবেষণাগারে, ফ্র্যাকেনস্টাইনের মত ফ্র্যাকেনমাছিগুলোর গল্ল যেন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। ধরুন, একটা জিনের এদিক ওদিক করে মাছির মাথা থেকে শুঁড়ের বদলে দু'টো পা বের করে দিলেন, একটা মাত্র জিনের মিউটেশন থেকে তার এক জোড়া পাখার বদলে চার, ছয় বা অঙ্গস্ত পাখা যোগ করে দেওয়া হল, কিংবা পাখাগুলো একেবারে উবেই গেল। একটা মাত্র জিনের রবদবদলের ফলে যদি এরকম নাটকীয় পরিবর্তন সন্তু হয় তাহলে তো প্রশ়্ন জাগে, এই জিনগুলো আসলে কী, এদের আসলে কাজ কী? কিংবা, ধরুন, ইঁদুরের চোখের জিনটাকে (একই জিন কিন্তু মানুষের মধ্যেও আছে) মাছির ভূঁপের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হল, দেখা গেল যে, সেখানে দিব্য ইঁদুরের নয় বরং মাছির চোখের টিসু তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নাহ, অলোকিক কোন গল্পের বই থেকে তুলে দেওয়া নয় উপরের কথাগুলো, কোন কল্পবিজ্ঞানের বই থেকে এই লাইনগুলো তুলে দেইনি। ডিস্কভারি ম্যাগাজিনের (ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়) এক সাক্ষাৎকারে হাল আমলের বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী ডঃ শন ক্যারল জীববিজ্ঞানের অন্যতম নতুন শাখা ‘এন্ডুলেশনারী ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজী’ বা সংক্ষেপে ‘এন্ডু ডেভু’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছিলেন [২]।

শুধু তো তাই নয়, বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখছেন, হাত, পা, গুঁড়, শিং, অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গলো বাইরের দিকে উদ্ধাত হয় তার সবগুলোর পিছনে একই সাধারণ জিনের হাত রয়েছে। ৭০-৮০ এর দশকে জেনেটিক্সের আলোয় যতই আমরা আমাদের কোষের

অভ্যন্তরের সুস্থ গঠন এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম ততই যেন হা হয়ে থাকার পালা শুরু হল। বিজ্ঞানীরা চরম বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন যে, প্রকৃতিতে এত পার্থক্য, এত জৈব-বৈচিত্র্যকে একেবারে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বারবার একই ফলাফল চোখে সামনে ফুটে উঠছে – শুধু মানুষে আর শিশুজীবেই নয়, ইঁদুর থেকে শুরু করে পাথি, প্রজাপতি, ফলের মাছি এমনকি ব্যাট্রেরিয়া – সবার মধ্যেই অকল্পনীয় রকমের জেনেটিক সাদৃশ্য বিদ্যমান!

আর এই সব গবেষণার হাত ধরেই গত ২০-৩০ বছরে জীববিজ্ঞানের এই নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনীয় বিকাশমান জীববিজ্ঞান (Evolutionary Developmental Biology) বা সংক্ষেপে ‘এন্ডু ডেভু’ [৩]। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছে এই শাখাটি। এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিবর্তন নিয়ে লিখতে বা পড়তে গেলে এভু ডেভুকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ১৫০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ‘হ্যান্ডসেক’ ঘটেছে ভূগতত্ত্বের (embiology) সাথে জীববিজ্ঞানের ভিত্তি বিবর্তনতত্ত্বের (evolution)। আর তাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার পিছনে অবদান রাখছে ফসিলবিদ্যা, প্রাণরসায়ন, আণবিক জীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স থেকে শুরু করে কম্পিউটার প্রযুক্তি পর্যন্ত অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। এর বিভিন্ন কাজ এবং অত্যাশার্য সব গবেষণার ফলাফলগুলোর ভিতরে ঢোকার আগে, এভু ডেভুর সংজ্ঞটা কী দাঁড়াচ্ছে, সেটা চট করে তাহলে একবার দেখে নেওয়া যাক।



চিত্র ২: ডিস্টাল লেস নামক একটি মাত্র জিন সামুদ্রিক পোকা থেকে শুরু করে ইঁদুর, এমনকি মানুষের প্রত্যঙ্গ গঠনের জন্য দায়ী। এই ধরনের ‘মাস্টার টুলকিট’ জিনগুলোর আবিষ্কার প্রাণিজগতের বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আবার নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে। ছবিতে মানুষের সতের দিন বয়সী একটি ভূগ দেখানো হয়েছে।

আমরা বিবর্তনতত্ত্ব থেকে জানি যে সময়ের সাথে জীবের

২০০৬ সালে ড. নীল সুবিন আর তার গবেষণাদল কানাডার উত্তর মেরঞ্জতে এমন এক মাছের ফসিলের সন্ধান পান যা কিনা পানি থেকে মাছের ডাঙায় উঠে আসার বিবর্তনের সময়টার সাক্ষ্য বহন করে। তারা এর নাম দেন টিকট্যালিক (Tiktaalik), প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটি মাছ এবং উভচরের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে। এর একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, গড়ন, আদি চোয়াল আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত ফ্ল্যাট মাথার দু'পাশে চোখ, করোটি, ঘাড়, পাজরের হাড়, আংশিক হাত, পা এমনকি কজির হাড়গুলো পর্যন্ত। এর মধ্যে ফুল্কা এবং ফুসফুস দুইই আছে, ফলে পানি এবং মাটি দুই জায়গায়ই স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারতো সে।

আকারে-গড়নে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে আর তা থেকেই উন্নত ঘটছে বিভিন্ন প্রজাতির। এখন ভৃণতত্ত্ব থেকে আমরা প্রথম বারের মত দেখতে পারছি জীবের গঠনের পিছনে কোন প্রক্রিয়াগুলো কাজ করছে। আমরা এখন ভূগের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ডিএনএ'র (DNA) নিউক্লিক এসিড (nucleic acid) বেসের ওপর কাজ করে দেখাতে পারছি যে, কোন জিনের কারণে কোন গড়নের জন্য হচ্ছে। এখানে দুই একটা বেস বদলে দিলে পা টা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, ওই জিনের এখানে কয়েকটা বেস বদলে দিলে পায়ের বদলে শুঁড় গজাচ্ছে, জিনের কোন জায়গাটা বদলে দিলে পায়ের বদলে শুধু হাতই জয়াচ্ছে না, একই জিন থেকে গজিয়ে যাচ্ছে মানুষের হাত, বাদুরের পাখা, সিলের তাঢ়নী! আর এটাই তো হচ্ছে বিবর্তনের ভিত্তি, সময়ের সাথে সাথে ডিএনএর পরিবর্তন। একটা জীব পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার পর তার দেহে এই পরিবর্তনগুলো ঘটে না, তাই এই পরীক্ষাগুলো কোন পূর্ণবিকশিত জীবের দেহকোষে করা সম্ভব নয়। এই প্রথমবারের মত আমরা এগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারছি - আর আবারও নতুন করে, নতুন আঙিকে, নতুন জানের আলোয়

প্রথমবারের মত গবেষণাগারে আমাদের চোখের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে বিবর্তনতত্ত্ব। ভূগের বিকাশ আর তার আলোর বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সময়েই গড়ে উঠেছে এই বিবর্তনীয় বিকাশমান জীববিজ্ঞান বা এভু ডেভু।

খুব বেশি বৈজ্ঞানিক জটিল ব্যব্যায় না গিয়ে খুব সোজাভাবে এভু ডেভুর মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আমাদের ডিএনএর মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ প্রোটিনকে সংকেতাবদ্ধ করে, অর্থাৎ জিন হিসেবে কাজ করে। তাহলে আমাদের জিনোমের বাকি ৯৮.৫ ভাগের মধ্যে কি আছে? এতদিন বিজ্ঞানীরা এর সবটাকেই জাংক বা বাতিল ডিএনএ বলে ধরে নিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে প্রায় ৩ ভাগ ডিএনএ আসলে নিয়ন্ত্রিক জিন বা রেগুলেটরি জিন হিসেবে কাজ করে। এই জিনগুলোই ভূগবস্থায় কোন জিন কোথায় এবং কখন কোন অঙ্গ গঠন করবে তার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত পঠায়। দু'টি প্রজাতির মধ্যে জিনের সংখ্যা কত, তা দিয়েই শুধু তাদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো নির্ধারণ করা যাবে না, তাদের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং গঠনের পিছনে এই নিয়ন্ত্রক জিনের সুইচগুলো কী ভূমিকা রেখেছে তাও দেখতে হবে। অর্থাৎ, বিবর্তনের ধারায় নতুন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি এবং বিকাশকে বুঝতে হলে তাদের জিনোমে ক'টি জিন আছে তাই-ই নয়, বরং এই জিনগুলো কোথায় কখন কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোন নিয়ন্ত্রক জিন এর পিছনে ভূমিকা রেখেছে তাও বুঝতে হবে। [১]

২০০৬ সালে ড. নীল সুবিন আর তার গবেষণাদল কানাডার উত্তর মেরঞ্জতে এমন এক মাছের ফসিলের সন্ধান পান যা কিনা পানি থেকে মাছের ডাঙায় উঠে আসার বিবর্তনের সময়টার সাক্ষ্য বহন করে। তারা এর নাম দেন টিকট্যালিক (Tiktaalik), প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটি মাছ এবং উভচরের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে। এর একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, গড়ন, আদি চোয়াল আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত ফ্ল্যাট মাথার দু'পাশে চোখ, করোটি, ঘাড়, পাজরের হাড়, আংশিক হাত, পা এমনকি কজির হাড়গুলো পর্যন্ত। এর মধ্যে ফুল্কা এবং ফুসফুস দুইই আছে, ফলে পানি এবং মাটি দুই জায়গায়ই স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারতো সে। বিজ্ঞানীরা এই মধ্যবর্তী ফসিলের আবিষ্কারে যতটা না অবাক হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হলেন এই দেখে যে এর মধ্যে ইতোমধ্যেই হাতের কজিরও অস্তিত্ব ছিল। কারণ এতদিন ধারণা করা হতো পানি থেকে মাটিতে পরিপূর্ণ অভিযোজনের পরেই শুধুমাত্র কজির মত এত জটিল গঠনের বিবর্তন ঘটেছিল। [৪]

টিকট্যালিকের মত পুরনো ফসিল থেকে তো আর ডিএনএ খুঁজে পাবার কোন আশা নেই, তাই কোন জিনের মিউটেশনের ফলে আসলে এই বিবর্তন ঘটেছিল তা বলাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, একবিংশ শতাব্দীতে বেস গবেষণা করার ফলে ড. সুবিনের হাতে এমন কিছু অস্ত্র ছিল যা ডারউইনের সময়

বা তার পরবর্তী প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীর হাতে ছিল না। তারা ফসিল থেকে তাদের দৃষ্টি ফেরালেন হাই-টেক আগবিক ডিএনএর গবেষণায়। তারা প্যাডেল মাছ নামে অত্যন্ত প্রাচীন কিন্তু এখনও টিকে আছে এমন এক মাছ নিয়ে কাজ শুরু করলেন। বিস্ময়ের সাথে তারা দেখতে পেলেন যে চতুর্পদী প্রাণীদের মতই এই অত্যন্ত প্রাচীন মাছটার মধ্যেও একই নিয়ন্ত্রক জিনের সুইচের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ থেকে কি প্রমাণ হয়? আর কিছুই নয়, গরু, ঘোড়া, মানুষ, পাখির মতই মাছের মধ্যেও, হাত পা ডানা বা আঙুলের বিবর্তনের অনেক আগে থেকেই তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনগুলো ছিল। কিন্তু একে কোন পরিবেশে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছে সেটার ওপরই নির্ভর করেছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের বিকাশ। [৫]

গত দুই তিন দশকে এরকম ভূরিভূরি উদাহরণ জমা হয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে। এভু ডেভুর এই গবেষণাগুলো থেকে ত্রুমশং পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, বিবর্তনের বড় বড় (প্রাণীর পানি থেকে মাটিতে বিবর্তনের মত বড় ধাপগুলো) ধাপগুলোর জন্য সবসময় বড় মিউটেশন বা তা থেকে হাজারো নতুন নতুন জিনের উত্তরের প্রয়োজন হয়নি, এর পিছনে জিনের সুইচগুলোও বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে।

বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট মায়ার প্রায়ই একটা কথা বলতেন – খুব কাছের প্রজাতিগুলো ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে একই ধরনের জিন খোঁজার কোন অর্থ হয় না। আসলে শুধু আর্নেষ্ট মায়ারকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি, কিছুদিন আগেও তো যে কোন জীববিজ্ঞানীই ভাবতেই। যেমন ধরন, এতদিন ধারণা করা হতো যে, প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রাণীর চোখে এত বৈচিত্র্য আছে যে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একেক প্রাণীতে একেক সময় আলাদা আলাদাভাবে এর উত্তর ঘটেছে। এভু ডেভুর গবেষণা থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাছির পুঞ্জাক্ষি থেকে শুরু করে পাখি, ইঁদুর, মানুষ, গরু, ঘোড়াসহ সব ধরনের চতুর্পদী প্রাণীর জটিল চোখের বিবর্তনের পিছনে প্যাক্স-৬ নামে একটি সাধারণ জিনই দায়ী। গত ৫০ কোটি বছর ধরে আলাদা আলাদাভাবে বিবর্তিত হওয়ার পরও তাদের বিভিন্ন ধরনের চোখের বিবর্তন কিন্তু ঘটেছিল এই প্যাক্স-৬ জিন থেকেই। [১]।

আমাদের নিজেদের বিবর্তনের ধারাটি পুরোপুরি বোঝার ক্ষেত্রেও কিন্তু এভু ডেভুর অবিক্ষিরণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা সেই অনাদি কাল থেকেই নিজেদেরকে প্রাণিগতের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থানে বসিয়ে রেখেছি। হাঁ, এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা এই ছোট প্রথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু আবার আমাদের সাথে শিস্পাঞ্জী বা ইঁদুরের জিনোমের অভাবনীয় সাদৃশ্যও বাস্তবতা বই আর কিছু নয়। আমাদের বুদ্ধিমত্তা, ভাষা বা বিপদী হয়ে ওঠার মত ‘মানবিক’ বৈশিষ্ট্যগুলোর

পিছনে অভিনব কিংবা আলাদা ধরনের কোন জিন খোঁজার দিন হয়তো ফুরিয়েছে। আমাদের কাছের অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে বিদ্যমান জিনোমের মধ্যেই হয়তো ঝুকিয়ে আছে আমাদের এই ‘মানুষ হয়ে ওঠা’র পিছনের গুট রহস্য। জীববিজ্ঞান আজকে এক অভূতপূর্ব স্তরে প্রবেশ করেছে। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমরা কোন জিনগুলোর প্রভাবে এক কোষী ভূগ থেকে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু তো তাই নয়, অবাক বিস্ময়ে দেখছি, হাতের সাথে পায়ের পার্থক্য কোথায়, কত অল্প পরিবর্তনেই হাতের বদলে বাদুড়ের পাখার বিবর্তন ঘটে যেতে পারে। এভু ডেভুই হয়তো আমাদেরকে বিবর্তন নিয়ে সংশয়ের কফিনে শেষ পেরেকটা মারতে সহযোগিতা করবে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত বিবর্তনও আজ এক্সপ্রেসিমেন্টাল বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে রূপ নিতে চলেছে। জীবের আকারে, গঠনে বিবর্তন ঘটচ্ছে-এটা দেখানোতেই আর সীমাবদ্ধ নেই বিবর্তনবাদ, কীভাবে এই জটিল গড়নগুলো তৈরি হচ্ছে সেই রহস্যের গভীরেও আমাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। জীবের বিবর্তনকে শুধু কোটি কোটি বছরের ফসিলের আলোয় বা ডিএনএ’র ভিতরে লেখা তথ্যের ভিত্তিতে বা ব্যাট্রেরিয়ার জনপুঞ্জে ঘটা পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমরা জানবো না, চোখের সামনে গবেষণাগারেই প্রমাণ করতে পারবো আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের প্রতিটি ধাপ।

তথ্যসূত্র

- Carroll S, 2005, *Making of the Fittest*. W.W. Norton & Company.
- <http://discovermagazine.com/2009/mar/19-dna-agrees-with-all-the-other-science-darwin-was-right>
- যুক্তি, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১০, শন ক্যারলের সাথে সাক্ষাকারঃ ডি এন এ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে ডারউইন সঠিক ছিল।
- Shubin N, 2008, *Your Inner Fish*. Vintage Books.
- <http://www.nytimes.com/2007/06/26/science/26devo.html>

